আমাদের কালঃ ইকবালের প্রাসঙ্গিকতা

শাহেদ আলী

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

আমাদের কালের অর্থাৎ এই মুহূর্তের বাস্তবতাগুলো দুর্নিরীক্ষ্য নয়। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিঃ সাম্রাজ্যবাদের অর্গল ভেঙে পৃথিবীর প্রায় সব জনপদ এবং রাষ্ট্র, যার মধ্যে মুসলিম দেশগুলোও রয়েছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে; পৃথিবীর দু’টি পরাশক্তির একটি, ব্যক্তি সত্তাবিনাশী, নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিজমের ঘাটি সোভিয়েট রাশিয়ার পতন হয়েছে, খোদ সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব য়ূরোপের বলকান রাষ্ট্রসমূহে কম্যুনিজমের বিলুপ্তি ঘটেছে। আফগানিস্তানে কম্যুনিজমের ভরাডুবি হয়েছে। অপরদিকে অন্য পরাশক্তি আমেরিকা, গণতন্ত্রের নামে, তার য়ূরোপীয় দোসরদের নিয়ে পুঁজিবাদ শব্দটিকে আড়ালে রেখে চাতুর্যের সাথে বিশ্বজুড়ে বাজার-অর্থনীতি চালু করেছে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য জগৎ সাম্রাজ্য গুটিয়ে দোকানদারিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই মুহূর্তের আরেকটি বাস্তবতা হচ্ছে-মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামের পুনরুত্থানের আলামত। ইরানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সারা বিশ্বের মুকাবিলায় এ-ই প্রথম একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা; রাশিয়ার অভ্যন্তরে ৬টি মুসলিমপ্রধান অঞ্চলের আযাদী, যুগোস্লাভিয়ায় মুসলিম বসনিয়া-হার্জেগোভিনার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করার পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র, আবিসিনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামী ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতা অর্জন; ভারতে কাশ্মীরীরা আযাদীর জন্য মরণ-পণ জিহাদে লিপ্ত; ফিলিপাইনে মরো মুসলমানেরাও বুকের খুন ঢেলে ছিনিয়ে আনতে চাইছে তাদের মুক্তি। অর্থাৎ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র আযাদীর সংগে, ইসলামের আলোকে নিজেদের জীবনকে নির্মাণের জন্য একটা প্রবল আকুতি দেখা যাচ্ছে। তৃতীয় বাস্তবতা হচ্ছে মৌলবাদের ধুয়া তুলে আতংকিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেকুলার ও তথাকথিত গণতন্ত্রী শক্তিগুলো মুসলিম বিশ্বের উপর থাবা মারার পাঁয়তারা করছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সম্প্রতি বলেছেনঃ ইসলাম প্রতীচ্যের হামলার বিষয় হয়ে উঠেছে। অবশ্যি তার জন্য তিনি মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র দলের অপরিণামদর্শী সহিংসতাকে দায়ী করেছেন। পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েট রাশিয়া ও নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিজমের পতনের পর পশ্চিমা জগৎ এখন মুসলিম জাতিপুঞ্জের জাগরণকে তাদের প্রতিপক্ষ গণ্য করছে। এবং তাকে নির্মূল করার জন্য মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা তৈরির উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী মৌলবাদের ধুয়া তুলছে।

ইকবাল যেহেতু তাঁর কাব্য ও দর্শনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক জীবন-দর্শনের ত্রুটি তুলে ধরেছেন এবং ইসলামী জীবন-দর্শনের মৌল প্রেরণায় মুসলিম জাহানের মুক্তি ও জাগরণের জন্য আশা-উদ্দীপনার অনিবার্য আবেগ সৃষ্টি করেছেন, তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই দ্বন্দ্ব ইকবাল পরিকল্পিত বিশ্বে কতটুকু যৌক্তিক তা বিবেচনার দাবী রাখে। ইকবালের খুদীতত্ত্ব, যার মূল কথা হলো ব্যক্তিসত্তার বিকাশ এবং বিরামহীন কর্মতৎপরতা ও সংগ্রামের আদর্শ, তাতে পাশ্চাত্যের লিবারেলিজম-এর যে আদর্শ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তারই স্বীকৃতি রয়েছে, যদিও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিসত্তার বিপদ সম্পর্কে ইকবাল সতর্ক, অন্যদিকে সমাজের উপর গুরুত্ব দিয়ে সমাজকে খুদী বা ব্যক্তিসত্তায় লালন-পালন ও বিকাশের ক্ষেত্র ঘোষণা করে সমাজবাদী চিন্তাধারাকেও যথাযোগ্য মূল্যদান করা হয়েছে। এভাবে আসরারে খুদী ও রমূযে বেখুদীতে তিনি ব্যক্তি-সমাজের মধ্যে একটা ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করে অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সর্বগ্রাসী সমূহবাদের ত্রুটিগুলো থেকে মানব জাতিকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন-কেবল মুসলমানদের নয়, আধ্যাত্মিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে এ ধরনের ব্যক্তি ও সমাজ সর্বপ্রকার আতিশয্য থেকে মুক্ত থাকে বলেই এ সমাজ একটা শান্তিকামী, সহিষ্ণু, উদার সমাজ। এ সমাজ সংঘর্ষ সৃষ্টি করে না, বরং এ সমাজবহির্ভূত আর সকলের জন্য একটা নমুনা স্থাপন করে, সবাইকে এই নমুনায় নিজ সমাজ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়।

ইকবাল পাশ্চাত্যের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে পাশ্চাত্যের প্রতি ঘৃণা নেই; তিনি কেবল তার ত্রুটিগুলোর প্রতি অঙ্গুলি

নির্দেশ করেছেন সংশোধনের প্রত্যাশায়। পক্ষান্তরে নির্জীব, উদ্যোগ ও ব্যক্তিত্বহীন নিজ সমাজকেই সমালোচনার কষাঘাতে রক্তাক্ত করেছেন, মোল্লা ও খানকা ব্যবসায়ী পলায়নবাদী সূফীদের অন্ধতা ও পরাজয়ী মনোভাব থেকে মুক্ত করার জন্য তীব্র ভাষায় তাদের আক্রমণ করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর উদ্দেশ্য ধ্বংস বা অভিসম্পাত নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানব ভ্রাতাদের মধ্যে সত্য ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, তাঁদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

কয়েক বছর আগে, এক বিখ্যাত খৃষ্টান ধর্মযাজক বলেছিলেনঃ কম্যুনিজম ও ইসলাম দু-ই পাশ্চাত্য সভ্যতার দুশমন, দু-ই ক্যাপিটালিজম বা ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়, দু-ই ব্যক্তিগত সম্পত্তির শত্রু। এতোদিন পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দুনিয়া কম্যুনিজমকে তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তাকে ধ্বংস করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য বলে স্থির করেছিলো-যদিও উভয়ে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস ও আকীদায় জড়বাদী। আজ কম্যুনিজমের ধ্বংসের পর তাদের কাছে ইসলামই এখন একমাত্র শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মাহাথিরের ভাষায়ঃ ইসলাম এখন পাশ্চাত্য জাতিসমূহের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠেছে। মাহাথির একটি ক্ষুদ্র মুসলিম গ্রুপের সহিংসতার জন্যই পশ্চিমা জগতের এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন। শোষণ, জুলুম, নিপীড়নের বিরুদ্ধে ইসলামের আপোষহীন মনোভাব রয়েছে-একথা সত্য। মুসলমানেরা তাদের নিজ নিজ ভূখণ্ডে সম্মানের সংগে নিজের মতো করে বাঁচতে চায়, নিজেদের জীবন-দৃষ্টির আলোকে নিজেদের জীবনকে গড়তে চায়। এতে আন্তর্জাতিক, সাম্রাজ্যবাদীচক্র এবং তাদের তাঁবেদার মুসলিম শাসকগোষ্ঠী আতংকিত হয়ে তাদের নির্মূল করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তারা ক্ষমতায় এলেও তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তাদের উপর অত্যাচারের নির্মম স্টীমরোলার চালাচ্ছে। আলজেরিয়ার কথা আপনারা বিবেচনা করে দেখুন।

ফিলিস্তিনের আদি অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ফিলিস্তিনে-লেবাননে বছরের পর বছর ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুদের নির্মম হত্যাযজ্ঞ, মিসরে ফেরাউনী শাসনের বিরুদ্ধে ইসলামপন্থীদের আন্দোলন তাদের ফাঁসি ও হত্যা, কাশ্মীরে নিজ বাসভূমে পরাধীন কাশ্মীরীদের নিধন যদি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং কিছু বেপরোয়া লোক যদি উপায়ান্তর না দেখে সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে, তা-ই বড়ো হয়ে দেখা যায় পশ্চিমা পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর কাছে, লাখো লাখো মানুষের দাসত্ব ও পরিকল্পিতভাবে তাদের হত্যা ওদের নজরে পড়ে না। বসনিয়ায় প্রায় দু বছর ধরে লাখো লাখো মুসলমানের হত্যা, নারী ধর্ষণ, শিশু হত্যা দেখেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চোখ বুঁজে থাকে। তাদের বিবেক জাগ্রত হয় না। মানবাধিকার কমিশন এ নিয়ে মুখ খোলে না। অসন্তোষের মূল কারণগুলো দূর করার চেষ্টা করলে অর্থাৎ প্রত্যেকটি দেশ ও জনপদকে তার নিজের মতো করে বাঁচার সুযোগ দিলে সুস্থভাবে সকল জাতি-গোষ্ঠী বিকশিত হবার পরিবেশ পেলে সংঘর্ষ ও সংঘাতের অবকাশ কমে যেতো।

> ইকবাল যে রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন তা কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র, এর সংগে বর্তমান পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার মৌলিক পার্থক্য অবশ্যি রয়েছে। সেই ১৯৩২ সালেই ইকবাল বলেছিলেন, প্রতীচ্য যে উপার্জনসর্বস্ব অর্থনীতি গড়ে তুলে প্রাচ্য জাতিসমূহের উপর চাপিয়ে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে এশিয়ায় জাতিসমূহের বিদ্রোহ অনিবার্য।

আপনারা যে ধর্মের অনুসারী তাতে ব্যক্তির মূল্যের স্বীকৃতি রয়েছে এবং তাকে নিয়মের অধীনে আনা হয় তার সর্বস্ব আল্লাহ ও মানুষের খেদমতে বিলিয়ে দেবার জন্য। তার সম্ভাবনা এখনো ফুরিয়ে যায়নি। এ জীবন-দর্শন এখনো এমন এক নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম যেখানে মানুষের সামাজিক মর্যাদা তার জাতি, বর্ণ অথবা অর্জিত সম্পদ দ্বারা নির্ধারিত হয় না বরং তা নির্ধারিত হয় জীবনের ধরণ দ্বারা, যেখানে মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে উদরের সাম্যের উপর নয় বরং আত্মার সাম্যের উপর, যেখানে একজন অচ্ছ্যুৎ বিয়ে করতে পারে একজন শাহানশার কন্যাকে, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা একটি আমানত, যেখানে সম্পদ উৎপাদনকারীদের উপর আধিপত্যের জন্য পুঁজি জমা করার অধিকার দেওয়া হবে না।

অবশ্য এই সমাজকে বাস্তবের রক্তমাংসে জীবন্ত করে তুলতে হলে ইকবালের মতে কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে। রমূয-ই-বেখূদীতে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে ছয়টি শর্তারোপ করে ইকবাল বলেছেনঃ

১। মানব সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি ভূমি হবে তাওহীদ,

২। তাওহীদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্য থাকবে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব,

৩। সমাজকে পরিচালিত করার জন্যে একটি মৌলিক নীতিমালা অপরিহার্য,

৪। একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র থাকবে,

৫। একটি বিশেষ আদর্শের প্রতি সমাজের সদস্যবৃন্দকে পরিচালনের উদ্যম সঞ্চারের লক্ষ্যে থাকবে একটি যথাযোগ্য আদর্শ যা সাথে সাথে তাদের মধ্যে একত্ববোধ ও সুসামঞ্জস্য বিধান করবে,

৬। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে আয়ত্তে আনয়নের প্রয়াস থাকবে।

ইকবাল বলেন, এই অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শবাদকে থিয়োলোজিয়ান ও বিধান-কর্তাদের মধ্যযুগীয় খেয়াল থেকে মুক্ত করতে হবে। আত্মিক দিক দিয়ে আমরা বাস করছি চিন্তা ও আবেগের কয়েদখানায়, যে কারাগার আমরা কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে তুলেছি আমাদের চারপাশে। অর্থাৎ ইজতিহাদের অধিকার প্রয়োগ করে, এসব মৌলনীতিমালার আলোকে, প্রতিটি মুসলিম দেশে একটি সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এ ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় কেবল তারাই আতংকিত হতে পারে যারা মানবতাবর্জিত, জীবনের মহৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অন্ধ। সত্যিকার মানবতাবাদী রাষ্ট্র এ ধরনের সমাজকে সহযোগী বন্ধু পরিবার মনে করে, পাশাপাশি শান্তি-সম্প্রীতিতে বাস করতে আগ্রহী হবে, সুস্থ মানবপ্রকৃতির এ-ই তো দাবি। মুসলিম জাতিগুলোর উচিত আপাতত নিজ নিজ চৌহদ্দির মধ্যেএ ধরনের কয়েকটি সমাজ গঠনের জন্য নিষ্ঠার সংগে কাজ করা। এতে করে সংশয় ও সন্দেহের অবসান হবে।

রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম-এ ইকবাল বলেনঃ ইসলাম সমস্ত জড়বস্তুর বন্ধন ও গোলামীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। ইসলামে জাতীয়তার ভিত্তি একটি খাঁটি ও পবিত্র পরিকল্পনার উপর স্থাপিত। ইসলাম এমন এক মানব গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে চায়, যাদের মধ্যে বর্ধিত ও সম্প্রসারিত হবার পূর্ণ উপযোগিতা স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান। ইসলামে জাতীয়তার ধারণা জাতি সম্পর্কিত অন্য সকল মতাদর্শ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর মূল আদর্শ ও ভিত্তি ভাষার ঐক্য নয়, বাসস্থানের ঐক্য নয়; বরং এর মূল নিয়ম হচ্ছে নিখিল সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে মত ও বিশ্বাসের ঐক্য ও সামঞ্জস্য-যা সব মানুষকে এক অবিচ্ছেদ্য শাশ্বত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে দিতে সক্ষম। এ মতাবলম্বী ব্যক্তি আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো, বীর আরব বেদুঈন, গংগার তীর ভূমির অধিবাসী আর্য অথবা পামীরের উচ্চতর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী যে-ই হোক না কেন, তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য করে না। দেশ ও মাটির পার্থক্য তাদেরকে বিছিন্ন করে রাখতে পারে না, কোনো বস্তুতান্ত্রিক বা ভৌগোলিক সীমারেখার বৈষম্য তাদের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর রচনা করতে পারে না এবং কোন বংশ বা ভাষার বিরোধও তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

> ইকবাল পাশ্চাত্যের জড়বাদ, নীরিশ্বরবাদ ও ধনতান্ত্রিকতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সংশোধন করতে চেয়েছেন এসবের মানবতাবিনাশী সমূহ ক্ষতিকর পরিণাম সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়ে, ওদের অন্ধ অনুকরণ থেকে মুক্ত মুসলিম মিল্লাত ও প্রাচ্য জাতিসমূহকে স্বকীয় আদর্শের উপর নিজেদের সামগ্রিক জীবন গড়ে তোলার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর এই আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও নিজের মতো বাঁচার আকাক্ষা যাদের কাছে খারাপ লাগে, তারা যতো উদারতার কথাই বলুক, ধনে-সম্পদে, সামরিক শক্তিতে যতো শক্তিশালীই হোক, আসলেই এরা মানবতার দুশমন, তারা মুসলিম দেশগুলোকে তাঁবেদার করে রাখতে চায়, আত্ম-সম্মান নিয়ে বাঁচতে দিতে চায় না। ওরা ধর্ম নীতি-বিবর্জিত রাজনীতিকে নির্লজ্জভাবে অনুসরণ করে, আর ইকবালের ভাষায়ঃ রাজনীতি থেকে ধর্মনীতি বাদ দিলে যা থাকে তা হচ্ছে চেংগীজের নীতি।

এই চেংগীজখানী রাজনীতি আমরা দেখছি স্থায়ী পরিষদের ভেটোওয়ালা সর্দারদের মধ্যে ইরাক তাদের ইংগিতে ইরানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, আবার তারাই স্থায়ী পরিষদে প্রভাব খাটিয়ে কুয়েত দখলের অপরাধে ইরাককে ধ্বংস করেছে। ফিলিস্তিনে, কাশ্মীরে চেংগীজখানের বংশধরেরাই ধ্বংসলীলা চালিয়েছে, এরাই বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় মুসলমানদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছে, আর জাতিপুঞ্জ ও স্থায়ী পরিষদ তামাশা দেখেছে, ন্যাটো য়ূরোপের বুকে একটি মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্রকে নির্মূল করার এই বর্বরতম হত্যাকাণ্ডে সার্ব আর ক্রোটদের আগ্রাসনকে পরোক্ষ মদদ যুগিয়েছে।

এই পরিস্থিতি কি ইকবালের এই উক্তিকেই সমর্থন করে না: আমাকে বিশ্বাস করুন, য়ূরোপ আজ মানুষের নৈতিক অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। পক্ষান্তরে, যে-সব চূড়ান্ত ধারণা মানবাত্মার নিগূঢ় প্রদেশ থেকে কথা কয়ে ওঠে, আর বাহ্যঃদৃষ্টিতে বহির্মূখীরূপে প্রতিভাত অনুভূতিসমূহকে আন্তর্জাতিকতা গুণে গুণান্বিত করে; আর মুসলিম সমাজে এই ধারণাগুলো ঐশীবাণীর মাধ্যমেই প্রাপ্ত ও আয়ত্ত। মুসলিমের কাছে জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ব্যাপার। আজ আমাদের কর্তব্য হচ্ছে-ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে নিজেদের সমাজকে পুনর্গঠিত করা এবং এখন পর্যন্ত আংশিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত ইসলামী ধারণাবলীকে আত্মস্থ করে সেই আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-যা ইসলামের পরম লক্ষ্য।

আজ গণতন্ত্রের জিগির উঠছে আমাদের দেশে, এবং বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি দেশে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব নিয়ে রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। ভারত না-কি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র। আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা বলেন: সেক্যুলারিজম অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র এক সংগে চলে, ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত না হলে গণতন্ত্র অচল। আল্লামা ইকবাল বলেন: পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে মাথা গোণা হয়, হয় না ওজন করা। অর্থাৎ এ গণতন্ত্রে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণের স্থান নেই, কেবল সংখ্যারই গুরুত্ব। আবুল হাশিম তাঁর ক্রীড অব ইসলামে এরই ব্যাখ্যা করে বলেছেন : এ তো ৫১টি গাধাকে ৪৯টি শ্রেষ্ঠ আরবী ঘোড়া থেকে মূল্যবান মনে করা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রে আমরা কী দেখছি! রাজনীতি, অর্থনীতি ক্ষেত্রে ও সমাজে আর ভারতের ২০ কোটি মুসলমানের অবস্থান কোথায়? কত হাজার সাম্প্রদায়িক দাংগা হয়েছে ভারতে? মুসলিম সংখ্যাগুরু কাশ্মীরের মুসলমানদের স্বাধীনতার দাবি কি স্বীকৃত? আলজেরিয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে একটি ইসলামপন্থী দল ক্ষমতায় আসীন হতে যাচ্ছিলো। কী ঘটেছে তাদের ভাগ্যে? বিশ্বের গণতন্ত্রের মোড়লরা কি নির্বাচনে বিজয়ী এই দলকে সমর্থন করেছে, তাদের সাহায্যে এসেছে? পরাশক্তি এবং পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলো, রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র, স্বৈরাতন্ত্র যা-ই তাদের তাঁবেদার হিসেবে তাদের নীল-নকশা কার্যকরী করতে রাজি হবে তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করছে, মদদ জোগাচ্ছে-আর যারা নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়, তারা গণতন্ত্রী হলেও তাদের উৎখাত করছে। ধনীর স্বার্থে দরিদ্রের শোষণ হচ্ছে এ গণতন্ত্রের লক্ষ্য। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র জনগণের নৈতিক ও মানবীয় বিকাশের সর্বপ্রধান অন্তরায়।

জাতীযতাবাদের দাবি এখন খুবই বুলন্দ-ভূগোল, বর্ণ, ভাষা বা গোত্রভিত্তিক এই জাতীয়তাবাদের উস্কানি দিয়ে পৃথিবীকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করে নিজেদের মোড়লী জারি রাখছে পাশ্চাত্য জাতিগুলো। ইকবাল বলেন : এ ধরনের জাতীয়তাবাদে আমি দেখতে পাই নাস্তিক্যমূলক জড়বাদের জীবাণু, যাকে আমি মানবতার পক্ষে বৃহত্তর বিপদ সম্ভাবনা মনে করি। আমরা দেখতে পাই, এরকম একটি রাষ্ট্র যখন আকারে, জনবল, অর্থনৈতিক, সম্পদ ও সামরিক শক্তিতে বড়ো হয়, তখন তার অহমিকার সীমা থাকে না। নিজেদের সংখ্যালঘু ও দলিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠী শোষণ করে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো তাদের তাঁবেদার হয়ে ওঠে, ওরা হীনমন্যতা বোধের শিকার হয়, নামে স্বাধীন হয়েও কার্যত পরাধীন জীবন যাপন করে। পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে গঠিত পাকিস্তান, যার স্বাপ্নিক এবং দার্শনিক ছিলেন ইকবাল।

মিল্লাতের ধারণা বিকশিত করে ইকবাল-পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তোলায় পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ব্যর্থতা যে বৈষম্যের জন্ম দেয়, তারই ফাটল দিয়ে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা এখানে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, ফলে শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে ওঠে-অহেতুক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়। ইকবালের কল্পনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠা মানবতার বৃহত্তর বিপদ সম্ভাবনার নযীর আমরা আমাদের জীবদ্দশায়ই দেখলাম আমাদের দেশে। রক্তভিত্তিক জার্মান জাতীয়তাবাদের ধ্বংসলীলা দেখলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই ইকবাল ইন্তেকাল করেন, কিন্তু তাঁর আশংকা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। এতে ইকবালের ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয়, ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় মুসলমানদের। এই ব্যর্থতার খেসারত আজ তাদের দেশে দেশে দিতে হচ্ছে।

খিলাফতের মতো একটি সংস্থার মাধ্যমে ইকবাল একদিন বিশ্ব মুসলিমকে সংগঠিত করার স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর খিলাফতের যখন অবসান হলো, তুরস্ক নিজকে ঘোষণা করলো ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে, এবং আরব জাতিগুলো কয়েকটি স্বাধীন, অর্ধ-স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হলো, তখন ইকবাল স্বাভাবিকভাবে তাঁর এই চিন্তাধারার সংশোধন করে প্রত্যেকটি মুসলিম জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে বলেনঃ

এই মুহূর্তে, প্রত্যেকটি মুসলিম জাতিকেই তার নিজ সত্তার গহীনে দৃষ্টিপাত করতে হবে; কিছুকালের জন্য তার চিন্তার ক্যানভাসে তার নিজেরই ছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে-এভাবে সব কটি মুসলিম জাতি সংহত, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিমান হবার পরই তারা একটি জীবন্ত গণতন্ত্র সমাহার গড়ে তুলতে পারবে।

আর এহেন একতা সত্যিকারভাবে দেখা দিতে পারে এমন কতকগুলো স্বাধীন-সার্বভৌম ইউনিট সমবায়ে যাদের পরস্পরের মধ্যকার রেশিয়াল (জাতগত) প্রতিদ্বন্দ্বিতার বোঝাপড়া ও মীমাংসা হতে পারে একটি সাধারণ স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্খাজনিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দ্বারা। আমার মনে হয় আল্লাহ তায়ালা আমাদের ধীরে ধীরে এই সত্যই বোঝাতে চান যে, ইসলাম জাতীয়তাবাদও নয়, সমাজবাদও নয়; ইসলাম প্রকৃত প্রস্তাবেই একটি জাতিসংঘ যা কৃত্রিম সীমারেখা ও জাতগত বৈশিষ্ট্য মান শুধুমাত্র পরিচিতির খাতিরে, এসবের ভিত্তিতে সামাজিক সংশ্রব ও সম্পর্ককে ক্ষুণ্ন করতে নয়। এ মনোভাব থেকেই তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে একটা আলাদা রাষ্ট্র গঠনের ডাক দেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই পরামর্শেরই কিছুটা বাস্তবায়ন দেখি ওআইসি-ওর্গেনাইজেশণ অব ইসলামিক কান্ট্রিতে; যদিও এই প্রতিষ্ঠান সেই আধ্যাত্মিক রূহ থেকে বঞ্চিত যা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের জীবনী-শক্তি হতে পারে। প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রে ইকবাল-পরিকল্পিত সুষম, সুন্দর ইসলামী সমাজ গড়ে উঠলেই এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান একটি জীবন্ত সংগঠন

হয়ে ওঠতে পারে এবং বিশ্বের জাতিপুঞ্জের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে। এখনো এ প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গের কেবল কৌতুকই উদ্রেক করে। রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্য যেহেতু এক হয়, তাই ওআইসি অনেক ক্ষেত্রেই সম্মিলিতভাবে একক সিদ্ধান্তে আসতে পারে না; ফলে, তাদের শক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

ইকবাল তাঁর কবিতায় এই সংস্থা সংগঠনের আহ্বান করেন এভাবে-

প্রাচ্যের একটি সংস্থা গড়ে তোলো এবং শয়তানের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করো আন্ত্রিকতা ও ঝাণ্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরো।

এবং খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, তিনি তেহরানকে এই সংস্থার কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেনঃ

তেহরান যেন প্রাচ্যজগতের জেনেভা হয় তা হলেই হয়তো সমগ্র বিশ্বের অদৃষ্ট নেবে পরিবর্তিত রূপ

জালাল উদ্দীন রূমীর দ্বারা গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ আল্লামা ইকবাল কি তাঁর বিশুদ্ধ চিত্তে এই আভাস পেয়েছিলেন যে, বহু শতাব্দীর পর ইরানেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হবে এ যুগের প্রথম সার্থক ইসলামী রাষ্ট্র? যে কারণে তিনি তেহরানকেই আধুনিক ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্র হিসাবে নির্বাচনের পরামর্শ দিয়েছিলেন? তার স্বপ্নের পাকিস্তান ইসলামী বিপ্লবের ফল ছিলো না, এ ছিলো একটা রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিণতি-ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে যে নতুন ইরানের জন্ম হলো, তা প্রকৃত অর্থেই একটি ইসলামী বিপ্লবের ফল। প্রায় একই ভাষায় আল্লামা ইকবাল ও হযরত আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী কম্যুনিজম ও পশ্চিমা পুঁজিবাদী চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছেন এবং তার ক্ষতিকর প্রভাব ঝেড়ে-মুছে ফেলে নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার তাকিদ দিয়েছেন। রাব্বুল আলামীনই ইমাম খোমেনীকে আল্লামা ইকবালের উত্তরসূরী নির্বাচন করে ইকবালের স্বপ্নকে রক্ত-মাংসে জীবন্ত করে তোলার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

পাশ্চাত্যের বাজার অর্থনীতির জয়জয়কার এখন। আমরাও তালে তালে ডুগডুগি বাজাচ্ছি। যারা কেবল কাঁচামাল উৎপাদন করে, কিছুই রফতানী করে না; কাঁচা মাল ছাড়া, তাদের জন্য মার্কেট অর্থনীতির তাৎপর্য কী? শিল্প-উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর উৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য বাজার খুলে দেয়া; অনুন্নত বিশ্বে শিল্প বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়া; কর্মসংস্থানের উপায় না রাখা। ক্রেতা ও বিক্রেতা এই দুই শ্রেণীতে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোকে বিভক্ত করা। যদিও বলা হয় সকলের জন্য অবাধ বাজার সৃষ্টি এর উদ্দেশ্য। কিন্তু আসলে অনুন্নত দেশগুলোকে শিল্পোন্নত দেশগুলোর পণ্য বিক্রয়ের স্থায়ী বাজার সৃষ্টি এর চূড়ান্ত লক্ষ্য। এতে দরিদ্র দেশগুলোর সমস্ত সম্পদ গিয়ে পুঞ্জীভূত হবে ধনী দেশগুলোতে, গড়ে উঠবে ওদের পুঁজির পাহাড়। আর ওদের শোষণে অনুন্নত দেশগুলোর মানুষেরা সর্বশান্ত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে। আল্লামা ইকবালের একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধের ইতি টানছিঃ

হে পাশ্চাত্যবাসী।
আল্লাহর এ পৃথিবীকে একটি দোকান ঘর মনে করো না।
তোমরা যাকে এ হাটে স্বর্ণ মুদ্রা মনে করছো,
তা প্রমাণিত হবে মেকি বলে।
তোমাদের নিজেদের উদ্যত খঞ্জরের উপরই
আপতিত হবে তোমাদের সভ্যতা
ভঙ্গুর বৃক্ষ শাখায় নির্মিত নীড়
ভেঙে পড়বে-আজ নয়,
আগামীকাল
....
আজকের বিনম্র পিপিলিকারা
যে কিশতি বানাবে-গোলাপের পাপড়ি দিয়ে
তা-ই আমাদের পার করে নিয়ে যাবে
ঝড় ঝঞ্ঝা তরঙ্গ সংকুল সমুদ্রের ওপারে।

এই পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট ও রোগ ধরা পড়েছিলো কবির দিব্য দৃষ্টিতে-এর পতন আজ হোক, কাল হোক, অবশ্যম্ভাবী, যদি না এ ফিরে আসে ধ্বংসের কিনার থেকে, জীবনের প্রশস্ত আঙ্গিনায়, যেখানে দুনিয়ার মানুষ মিলিত হবে পরস্পর সহযোগী, ভাই হিসেবে, জনগণের বিশ্বসংঘে সুচতুর ষড়যন্ত্রী, কপটদের জাতিসংঘে নয়।

ইকবাল তাঁর নিসর্গ প্রেম, দেশপ্রীতি, সৌন্দর্যপ্রীতি ও বিশ্ব প্রেমের গভীর প্রাণস্পর্শী অনুভূতি প্রকাশ করেছেন প্রধানত কাব্যে, তাঁর অনুনকরণীয় ভাষা, ছন্দ ও গীতিময়তায়। তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারার বাহন হয়েছে, তাঁর কতকগুলো ইংরেজী ভাষণ-যা পাণ্ডিত্য, মনীষা, গভীর উপলব্ধি ও প্রত্যয়ী যুক্তির এক অপূর্ব নিদর্শন। শিল্পের জন্যই শিল্প, শিল্পের এ সংজ্ঞার তিনি বিরোধী; তাঁর মতে, জীবনের জন্যই শিল্প-অর্থাৎ শিল্প হচ্ছে জীবনেরই সমালোচনা, জীবনেরই ব্যাখ্যা। কাব্যের এ ব্যাখায় বক্তব্যই আসল লক্ষ্য, কাব্য সেই বক্তব্যের বাহন। উপরে কেবল ইকবালের দার্শনিক বক্তব্যেরই কয়েকটা দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর উপলব্ধির গভীরতা এতোই অতলস্পর্শী যে, তার প্রভাবে তাঁর ভাষাও হয়ে উঠেছে দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে যাওয়া এক অনুপম কাব্যের নিদর্শন। তাতেই এ প্রমাণ মেলে যে, আন্তরিকতার গুণেই তাঁর কবিতা তাঁর দেশ ও স্বজাতির হয়েও বিশ্বের সকল মানুষের কাব্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর কাব্যের এ দিকটা এ আলোচনায় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সীমাবদ্ধতার কারণেই আলোচিত হয়নি।

ইকবাল বলেন, তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছত্র তাঁর শোণিত বিন্দু দিয়ে রচিত মালা। তাঁর কবিতা, তাঁর বক্তব্য বা আশু পারিপার্শ্ব যা-ই হোক, তা ভাষা ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে সকল মানুষের সম্পদ হয়ে উঠেছে। ফুলের রঙ-বৈচিত্র্যে বা স্বর্ণের উজ্জ্বল প্রভা তার আরাধ্য নয়। তাই ইকবাল বলেনঃ

আমি ভাবী কালের কবি আমার সংগীদের উপর আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। আমি আমার সিনাইতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি- যেন তাতে করে আবির্ভাব হয় মুসার।

তিনি বলেন : ইকবাল এবং ইকবালের বিরোধীরা কেউ বেশি দিন থাকবে না পৃথিবীতে। কিন্তু শুস্ক জমিনে ইকবাল যে বীজ বুনেছে তা একদিন অংকুরিত হবেই। তার চারা একদিন বেড়ে উঠে সকল বিরোধিতার মধ্যদিয়ে ফুল-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবেই। আমাকে দেওয়া হয়েছে এর জীবনী শক্তির প্রতিশ্রুতি।

যতোই দিন যাচ্ছে ততোই আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁর এই দাবির বাস্তবতা কতো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা আজ স্বীকৃত যে, ইকবাল সকল দেশের, সকল মানুষের, সকল কালের কবি। কারণ ব্যক্তি ও সমাজ মানুষের পরমোৎকর্ষের শাশ্বত স্বপ্নই তাঁর কাব্যের বাণী।

সূত্রঃ আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা, অধ্যাপক শাহেদ আলী সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০২

শাহেদ আলী